ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1666-1679
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.388

ঔপনিবেশিক ভারতে ঠগীদের অপরাধ: উইলিয়াম হেনরি স্লিম্যানের বিবরণ ও অপরাধ-তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

কুন্দন চক্রবর্তী, *স্বাধীন গবেষক, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 24.03.2026; Accepted: 27.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This study examines the criminality of Thuggee in colonial India through a critical and criminological reading of administrative narratives. It analyzes how the British administration represented Thugs as a mysterious and organized community of killers and portrayed their suppression as a significant achievement of colonial governance. By interrogating these narratives, the paper questions their evidentiary validity and explores the ways in which crime was conceptualized, constructed, and institutionalized within colonial discourse. The study seeks to reassess the idea of Thuggee beyond conventional historiography and to reinterpret it as a product of power, knowledge, and colonial intervention.

Keywords: Thuggee, William Henry Sleeman, Colonial India, Criminality, Colonial Discourse, Criminology, Mysterious Killers, Organized Crime

ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের বিভিন্ন উপাদানে উঠে এসেছে নানা অপরাধ এবং অপরাধীদের কথা এবং এই অপরাধীদের মধ্যে অন্যতম রহস্যময় সম্প্রদায়টি ছিল ঠগীদের। এরা ছিল অপরাধীদের একটি সংগঠন যারা তাদের বিচিত্র পদ্ধতির দ্বারা পথিকদের হত্যা করত এবং তাদের লুঠ করত। এদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল এরা নিজেদের অপরাধের কোন প্রমাণ রাখতো না। ব্রিটিশরা ভারতে নিজেদের ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই সম্মুখীন হচ্ছিল নানা অপরাধী এবং অপরাধের। তবে প্রাথমিক দিকে ব্রিটিশ প্রশাসন ঠগীদের অস্তিত্ব সম্পর্কে অবগত ছিল না। ব্রিটিশদের কাছে ঠগীদের প্রথম বিবরণ আসে ১৮১৬ সালে ডঃ রিচার্ড সি. শেরউড এর লেখা থেকে, যেখানে তিনি হিন্দুস্তানের দক্ষিণাঞ্চলে ঠগীদের অস্তিত্বের কথা বলছেন এবং ফাঁসিগার (Phasigars) শব্দটি ব্যবহার করেছেন ঠগীদের উদ্দেশ্যে। ইউরোপীয় সাম্রাজ্য ভারতবর্ষে বিস্তারের সাথে সাথেই ইউরোপীয় প্রসাশন লক্ষ্য করেছে যে ভারতবর্ষের রাস্তাঘাটে বিচরণকারী পথিকদের একটি বিরাট অংশ প্রতিবছর রহস্যজনকভাবে উধাও হয়ে যাচ্ছে এবং সংখ্যাটা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই ঘটনাগুলির পেছনে উঠে আসছে 'The phansigars', 'stranglers' শব্দগুলি এবং এই শব্দগুলি নেওয়া হচ্ছে হিন্দুস্তানি শব্দ ফাঁসি (phansi)। উত্তর ভারতে এই হত্যাকারীদের বা অপরাধীদের বলা হচ্ছে thugs অর্থাৎ প্রতারক। তামিল ভাষায় এদের বলা হচ্ছে- "অরি তুলুকার (ari tulucar) অর্থাৎ "মুসলমান ফাঁসুড়ে"। এই যে মুসলমান ফাঁসুড়ে কথাটি এটা সম্ভবত ঠগী গোষ্ঠীতে মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য, যা আমরা পরে আলোচনা করব।

অনুরূপভাবে কন্নড় ভাষায়–তান্তি কল-লেরু (tanti cal-leru) অর্থাৎ এমন চোর যারা একটি তার বা বিড়ালের অস্ত্র ব্যবহার করে ফাঁস হিসাবে। তেলেগু ভাষায়– ওয়ার্লু ওয়ার্ন্ডলু (warlu warndlu), ওয়ার্লু বৈষয় ওয়াহন্ডলু (warlu vayshay wahndloo) অর্থাৎ যারা ফাঁস ব্যবহার করে। ভারতবর্ষে ঠগীদের দমনের ক্ষেত্রে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন উইলিয়াম হেনরি স্লিম্যান যিনি ১৮৩০ এর দশক নাগাদ ভারতবর্ষে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। তাই এই রচনার প্রধান তথ্যসূত্র হিসেবে আমি ব্যবহার করেছি ১৮৩৯ সালে প্রকাশিত স্লিম্যানের History of the Thugs or Phansigars of India গ্রন্থটি। আমি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি একজন ব্রিটিশ প্রশাসক হিসেবে উইলিয়াম হেনরি স্লিম্যান ঠগীদের সম্পর্কে কী দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করছেন। এবং সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে ঠগীরা কেন অন্যান্য অপরাধী গোষ্ঠীদের থেকে আলাদা। এ প্রসঙ্গে যাওয়ার জন্য আমরা ঠগীদের অপরাধ পদ্ধতি বা মোডাস অপারেন্ডি, তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস, এবং সর্বোপরি নারীদের ওপর তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব।

স্লিম্যান সাহেবের লেখা থেকে জানা যায় ভারতবর্ষে প্রথম ঠগীদের গ্রেপ্তার করা হয় ১৮০৭ সালে, চিত্তর এবং আর্কট অঞ্চলের মধ্যে বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয় যারা লুঠের মাল নিয়ে ফেরত আসছিল। তারপর থেকেই কোম্পানির সামনে এই অপরাধীদের নৃশংসতা এবং চরিত্র প্রকাশ পায়। যদিও এই গ্রেপ্তারিতে স্লিম্যান যুক্ত ছিলেন না। তবে এই গ্রেফতারিগুলির মাধ্যমেই ঠগীদের সম্পর্কিত অনেক তথ্য ব্রিটিশ কর্তা-ব্যক্তিদের কাছে পৌঁছেছিল। তবে এই সময়ও সম্ভবত ইউরোপীয়রা ঠগীদের একটি পৃথক অপরাধী সম্প্রদায় হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি। স্লিম্যান সাহেবের লেখা থেকে আরও জানা যাচ্ছে এই ফাঁসিগাররা বা ঠগীরা দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে বসতি স্থাপন করেছিল। প্রথমে তারা বসতি স্থাপন করে মহীশূর এবং কর্ণাটকের সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে। এখানকার দুর্গম প্রাকৃতিক পরিবেশ পাহাড় এবং জঙ্গলগুলি তাদেরকে স্বাভাবিক সুরক্ষা প্রদান করেছিল। এবং দক্ষিণাত্যে ঠগীরা পলিগার বা স্থানীয় সামন্ত প্রভুদের সুরক্ষা লাভ করেছিল। এরা তাদের নিয়ন্ত্রণ করত এবং সুরক্ষা প্রদান করত এবং বিনিময়ে এদের লুণ্ঠিত সম্পদের একটি অংশ এই সমস্ত প্রভুরা লাভ করত। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে ঠগীরা একটি সামাজিক এবং রাজনৈতিক সুরক্ষা লাভ করতে শুরু করেছিল। ঠগীরা এই সমস্ত প্রভুদের অধীনে একটি পরিবারের মধ্যে বসবাস করত এবং প্রতিবেশীদের সঙ্গেও শান্তিপূর্ণ সুসম্পর্ক বজায় রাখত, এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই একটি পেশার সঙ্গে যুক্ত থাকত যা অনেক সময়তে চাষবাস সংক্রান্ত হতো। যার ফলে এদের আলাদাভাবে চিহ্নিত করা বেশ কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়াতো। তবে এইসব অঞ্চলগুলিতে কোম্পানির ক্ষমতা সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রভুদের ক্ষমতাও হ্রাস পায়। ঠগীরাও নিজেদের পদ্ধতি পরিবর্তন করতে শুরু করে এবং এই সময় থেকে নিজেরা স্বাধীনভাবে চলাফেরা শুরু করে। যার ফলে তারা সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে এবং সেই ভাবেই তাদের অভিযান পরিচালনা করতে থাকে। অনেক ঠগীদলই ছিল যারা যাযাবর প্রকৃতির, আবার অনেক ঠগীরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে নিজেদের স্থায়ী বসতি স্থাপন করে। তবে এই ঠগীদের অস্তিত্ব সম্পর্কিত জ্ঞান প্রশাসনিক স্তরেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু ১৮৩৬ সালে উইলিয়াম হেনরি স্লিম্যান ঠগীদের সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা কে একত্রিত করে রামাসীনা (Ramaseeana) বলে একটি বই প্রকাশ করেন, আর এরপর থেকেই ঠগীরা ইউরোপ তথা ভারতীয় সমাজে পরিচিতি লাভ করছে। ঠগীদের জনপ্রিয়তাতে ভূমিকা ছিল সাহিত্যেরও। ঠগীদের উপাত্ত করে প্রথম সাহিত্য রচনা করছেন ফিলিপ মিডোজ টেলর ১৮৩৯ সালে। তাঁর লেখা উপন্যাসটির নাম কনফেশনস অফ এ ঠগ। এর পর বহু সাহিত্যে ঠগীদের কথা উঠে আসছে। এবং প্রায় প্রত্যেকটি সাহিত্যেই ঠগীদের একটি নৃশংস হত্যাকারী রূপে চিত্রায়িত করা হয়েছে। স্বভাবতই পরবর্তীতে ঠগীরা সিনেমা নির্মাতাদেরও আকৃষ্ট করে এবং ঠগীদের নিয়ে বহু সিনেমা রচনা হয়। ঠগীদের কেন্দ্র করে প্রথম সাদা কালো সিনেমা হল গঙ্গা-দিন (১৮৩৯)। এরপর ১৯৬০ সালে দ্য

স্ট্র্যাংলারস অফ বোম্বে এবং ১৯৮৪ সালে নির্মিত স্টিভেন স্পিলবার্গ এর ইন্ডিয়ানা জোন্স অ্যান্ড দ্য টেম্পল অফ ডুম, ১৯৮৮ সালের দ্য ডিসিভার্স সিনেমাগুলিতে বারবার ঠগীদের প্রসঙ্গ তুলে ধরা হতে থাকে। এই সাহিত্য এবং সিনেমাগুলি ঠগীদেরকে একটি নৃশংস এবং রহস্যময় খুনি সম্প্রদায়ের রূপে সমাজের কাছে দৃঢ়ভাবে চিত্রায়িত করেছে। এমনকি ঔপনিবেশিক ঐতিহাসিকেরাও ব্রিটিশদের দ্বারা ঠগীদমনকে গৌরবান্বিত করেছেন। এই ঐতিহাসিকদের মধ্যে জেমস হিউটন এই ধারণাকে দৃঢ়ভাবে উপস্থাপন করেছেন। তবে মজার বিষয় হল ঠগীদেরকে বেশিরভাগ ঐতিহাসিকই হিন্দু ধর্মের নৃশংস অনুসারী রূপে বর্ণনা করেছেন, এবং এদের আচার অনুষ্ঠানগুলিকে বর্বর হিন্দু অনুষ্ঠান রূপে বর্ণনা করেছেন।[১]

তবে আমার মতে ঠগীদেরকে এতটা সরলরৈখিকভাবে বর্ণনা করা যায় না। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের বিভিন্ন দলিলে উল্লেখ রয়েছে বহু ধরনের অপরাধীদের। এবং এই সমস্ত অপরাধীগণ চিহ্নিত হতো তাদের কার্যপ্রদ্ধতির বা তাদের মোডাস অপারেন্ডির মাধ্যমে। উদাহরণ হিসেবে কয়েক প্রকারের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন ধুতুরিয়া- এরাও ছিল ভ্রাম্যমান খুনির দল। পথিকের ছদ্মবেশে এরাও ভারতবর্ষের রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়াতো এবং পথিকদের সঙ্গে ভাব জমাত এবং সুযোগ বুঝে তাদের খাবার বা হুকোর তামাকের সঙ্গে মিশিয়ে দিত ধুতরার বীজ। পথিক প্রাণ হারালে এরা তাদের সর্বস্ব লুট করতো। ধুতুরার বীজ প্রয়োগ করে হত্যা করত বলেই এদের নাম হয়েছিল ধুতুরিয়া। স্লিম্যান এর মতে এদের সংখ্যাও ছিল সহস্র। এরাও ঠগীদের মত নৃশংস এবং ধূর্ত হলেও এরা ছিল ঠগীদের থেকে আলাদা। অনেক সময়তে দেখা গেছে ঠগীদের জনপ্রিয়তার ফলে তাদের নকল করেই অপরাধীরা অপরাধীদের দল গড়ে তুলছে। এমনই এক উদাহরণ হল তুসমাবাজ ঠগ। এরাও ছিল ভ্রাম্যমান খুনি। এদের আবির্ভাব ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে। ক্রেয়াগ নামে কানপুর নিবাসী জনৈক ইংরেজ সৈনিকের হাত ধরে এদের উত্থান। ক্রেয়াগ ছিল স্বাধীন সৈনিক। হঠাৎ তার ইচ্ছে হয় সে ঠগী হবে। তাই যেমন ভাবা তেমন কাজ। তিনি বেশ কিছু শিষ্য জোগাড় করে কাজে নেমে পড়লেন। দেখতে দেখতে এদের দল উত্তর ভারতে ছড়িয়ে পড়ল। এই ক্রেয়াগ সাহেবের ঘটনাটি থেকে বোঝা যায় ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে শুধুমাত্র যে দেশীয় অপরাধীরা ছিল তা নয়, বরং অনেক সময় দেখা যাচ্ছে তথাকথিত সভ্য ইউরোপীয়রাও ভারতবর্ষের মাটিতে অপরাধ করছে। তুসমাবাজরা দিনে দুপুরে দল বেঁধে দড়ির খেলা দেখায়। একটি দড়ির ফাঁস তৈরি করে বাজি ধরে সেখানে পথিককে দিয়ে কাঠি দেওয়ানো হয়। যদি কাঠি দড়ির ফাঁসে আটকে যায় তাহলে পথিক জিতল। আর যদি ফাঁস কাঠিতে না আটকায় তাহলে পথিক হারলো। এই খেলাই হল তুসমাবাজী। সাহেবরা বলতেন প্রিকিং দি-গাটার। তুসমাবাজরা কখনো ঠকে না, বরং তারা পথিকদেরকে এই খেলায় ভুলিয়ে সর্বস্বান্ত করে। কিন্তু যদি কখনো দেখা যায় পথিক ক্রমাগত জিতে যাচ্ছে, তাহলে তাকে এরা বিষ প্রয়োগে হত্যা করে। এরাও ছিল সংখ্যায় বিপুল। ১৮৪৮ সালে কানপুরে প্রায় ৫০ জনের একটি তুসমাবাজ ঠগী দল ধরা পড়ে। এছাড়াও ছিল ম্যাকফেনসা, ঠ্যাঙারে প্রভৃতি সংঘবদ্ধ অপরাধীদের দল। তবে এরা সঙ্ঘবদ্ধ হলেও ঠগীদের সাথে এদের বেশ কিছু পার্থক্য ছিল। এদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল লুট করা এবং সেই প্রয়োজনে যদি হত্যা করতে হয় তাহলেও তারা পিছপা হত না। কিন্তু সত্যিকারের ঠগী কখনো হত্যা ছাড়া লুট করে না। এছাড়া ঠগীরা পরিচালিত হতো একটি সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে, যেখানে প্রত্যেকটি ঠগী দলে প্রত্যেকটি কাজের জন্য বিশেষজ্ঞ লোক ছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, প্রত্যেকটি

[১] *W.H. Sleeman, History of the Thugs or Phansigars of India, Philadelphia: Carey & Hart, 1839, pp. 14-15; Kim A. Wagner, Banditry and the British in Early Nineteenth-century India, New York, Palgrave, 2007, pp. 1-4*

দলে এমন কিছু লোক রাখা হতো যাদের প্রধান দায়িত্বই ছিল মৃতদেহ গুলি কবরস্থ করা। এমনকী এদের নির্দিষ্ট ভাষা পর্যন্ত ছিল, এরা নিজেদের পরবর্তী প্রজন্মকেও এই পেশাতে আসার জন্য রীতিমতো প্রশিক্ষণ দিত। সর্বোপরি ঠগীরা পরিচালিত হতো একটি সুনির্দিষ্ট ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এবং তাদের নিজস্ব বেশ কিছু ধর্মীয় বিশ্বাস ছিল যা তারা মেনে চলত। যদিও ঠগী দলে বিভিন্ন ধর্মের লোকরাই থাকতো কিন্তু তাও এই নিয়মগুলি সবার জন্যই ছিল সমান।[২]

অন্যান্য অনেক অপরাধীদের মত ঠগীরাও চালিত হতো একটি নির্দিষ্ট কার্যপদ্ধতি বা মোডাস অপারেন্ডি দ্বারা। ঠগী দের চিহ্নিতকরণের মূল বৈশিষ্ট্যই হল তাদের এই বিচিত্র অপরাধ পদ্ধতি বা তাদের মোডাস অপারেন্ডি। ঠগীদের বিরুদ্ধে অভিযানকালে বহু ঠগী ধরা পড়ে এবং তাদের জবানবন্দি থেকেই তাদের কার্য পদ্ধতির কথা জানা যায়। ঠগীদের কার্য পদ্ধতির সবথেকে বড় বৈশিষ্ট্য হলো এরা কখনোই খুন ছাড়া শুধুমাত্র লুটপাট করে না। তারা তাদের কর্মকাণ্ডের কোনরকম প্রমাণ রাখে না এবং হত্যা করার পর মৃতদেহগুলি কবরস্থ করে। ঠগীদের খুন করার পন্থাটি বড় অদ্ভুত। তারা তাদের শিকারকে গলায় ফাঁস দিয়ে শ্বাস রোধ করে খুন করে এবং এ কাজের জন্য তাদের অস্ত্রটিও বড়ই বিচিত্র। অস্ত্র বলতে মাত্র এক ফালি কাপড় যার মোট দৈর্ঘ্য ছিল ৬০ ইঞ্চি এবং দুভাঁজ করার পর সেটির দৈর্ঘ্য হতো ৩০ ইঞ্চি, এবং ১৮ ইঞ্চি দূরে দেয়া হত একটা শক্ত গিট। এবং গিটের ফাঁস মজবুত করতে সেখানে বেঁধে দেয়া হতো রুপোর মুদ্রা বা সিক্কা। এই কাপড় খন্ডটি হাঁটুর মধ্যে বেঁধে বা কোমরে গুঁজে এরা হেঁটে বেড়াতো মাইলের পর মাইল। এবং এই কাপড় খন্ডটি দেখলে কোনমতেই সন্দেহ হতো না যে এটি মানুষ খুনের কাজে ব্যবহার হতে পারে। এই কাপড় খন্ডটিকে তারা বলতো পেলহুঁ। ঠগীরা কিন্তু হঠাৎ করেই পথিকদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তো না। বরং তারা পথিকদের সাথে মিশে হয়ে উঠতো তাদের বিশ্বাসভাজন। ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে এক স্থান থেকে অন্য স্থান ভ্রমণের জন্য বড় বড় সড়ক ধরেই মানুষ ভ্রমণ করতো। এবং সেই সময়তে তারা নিজেদের সাথে প্রচুর জিনিসপত্র বহন করত। যদি কোন ধনী ব্যক্তি ভ্রমন করতেন তাহলে তিনি নিজের সাথে একটি বিরাট লটবহর এবং তাদের পার্শ্বচরদের একটি বিরাট বড় দল নিয়ে চলাফেরা করতেন। এমন কি অনেক ধনী ব্যাংকারেরাও তাদের সম্পদ গুলি এক শহর থেকে অন্য শহরে পাঠানোর জন্য সড়ক পথই ব্যবহার করত। পথিকেরা রাস্তার ধারের সরাইখানা গুলিতে রাত্রিযাপন করত। যে স্থানে কোন সরাইখানা থাকতো না, সেই স্থানে তারা খোলা আকাশের নিচেও রাত্রি যাপন করত। যারা একটু বিত্তশালী ছিল তারা নিজেদের সাথে তাঁবু বহন করতো এবং তারা গাছের ছায়াতে তাঁবু খাটিয়ে সেখানে বিশ্রাম করত। অনেক সময়ই ছোট ছোট দলগুলি বড় বড় দলগুলোর সাথে সুরক্ষার প্রয়োজনে একত্রিত হয়ে চলাফেরা করতো। এবং ভারতবর্ষের এই পরিবহন পরিস্থিতির সবথেকে বড় সুযোগ নিয়েছিল ঠগীরা। ঠগীরা সাধারণত বছরে এক থেকে দুটি অভিযান করতো। প্রত্যেকটি দলের একজন করে দলনেতা থাকতো যারা ঠগীদের কার্যপ্রণালী স্থির করতো। দলের সদস্যদের মধ্যে কেউ কেউ বাড়িতে থাকতো (হয়তো তাদের কাজ ছিল দলের বাকিদের পরিবারের দেখাশোনা করা) তারা ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান সড়ক গুলি দিয়ে চলাফেরা করতো এবং পথিকদের জন্য অপেক্ষা করত। এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পথিকদের অনুসরণ করত। এবং নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য তারা এটি নির্দিষ্ট স্থানে

[২] Sleeman (1839), p.16; শ্রীপান্থ, ঠগী, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৬০, পৃ. ৪৩- ৪৫; অরিন্দম রায়, "ঠগী- এক ভ্রাম্যমাণ খুনে সম্প্রদায় ও তৎকালীন অন্যান্য অপরাধ গোষ্ঠী", ইতিহাস ও সংস্কৃতি, খণ্ড ৪, ভাগ ৩, ২০১৮, পৃ. ১৬৫-১৬৬।

মিলিত হতো। ঠগীরা সাধারণত ছদ্মবেশ ধারণ করত এবং বেশিরভাগ সময়ই নিজেদেরকে বণিক বলে পরিচয় দিত। প্রয়োজনে তারা ঘোড়ার পিঠে চেপেও ভ্রমন করতো। এবং মূলত বড় সড়ক কিংবা এমন কোন শহরের কাছে অপেক্ষা করত যেখানে পথিকরা সাধারণত বিশ্রাম নেয় না। তারা সুন্দর আদব-কায়দা এবং কথার জালে পথিক দের থেকে খবর সংগ্রহের চেষ্টা করতো। এরা পথিকদের সাথে অকস্মাৎ দেখা হওয়ার ভান করত এবং তাদের ছলনার মাধ্যমে পথিকদের যাত্রা পথ সম্পর্কে খবর জোগাড় করত এবং কতটা ধন-সম্পত্তি বহন করছে তারও একটা অনুমান তারা করত। সন্দেহে এড়ানোর জন্য তারা কখনো কখনো নিজেদের সাথে ১০ বা ১২ বছরের বাচ্চা রাখতো।[৩]

যখন ঠগীরা তাদের শিকার সম্পর্কে নিশ্চিত হয় তখন, তারা সেই দলটির সঙ্গ নেয়। না হলে সেই দলটিকে অনুসরণ করে। তারা পথিকদেরকে নিরাপত্তার স্বার্থে একত্রে ভ্রমণ করার প্রস্তাব দেয়। কিছুদূর একসাথে চলার পর ঠগীরা একটি সুবিধাজনক স্থান নির্বাচন করে এবং দলের একজন সদস্য হঠাৎ করে হতভাগ্যদের গলায় ফাঁস দেয়। এই হত্যাকাণ্ডে সাধারণত তিনজন থাকে। হত্যার পদ্ধতি হলো একজন ঠগী ফাঁসের কাপড়টির সাহায্যে শিকারের গলায় ফাঁস দেয় এবং অন্য দুজন হাত এবং পা ধরে শিকারকে নিশ্চল করে। এই পরিস্থিতিতে প্রতিরোধের খুব সামান্য সুযোগই অবশিষ্ট থাকে এবং পা ধরে থাকা ব্যক্তিটি হতভাগ্যটির সংবেদনশীল স্থানে লাথি মারতে থাকে। ফাঁস দেওয়ার পদ্ধতিটি যেনো খড় এর আঁটি বাঁধার মতো। হত্যাকাণ্ডটির পদ্ধতিটির ভিন্নতা থাকলেও সাধারণভাবে এটিই প্রচলিত। কিছু জনকে হত্যার স্থলের সামনের দিকে রাখা হতো এবং কিছু জনকে পেছনের দিকে রাখা হতো। এদের উদ্দেশ্য থাকত হত্যার সময় অপ্রত্যাশিতভাবে যদি কেউ এসে পড়ে তাহলে তাদের প্রতিরোধ করা বা যদি কেউ পালানোর চেষ্টা করে তাহলে তাকে আটকানো। ঠগীরা হত্যা করবার জন্য বিশেষ রকমের জায়গা নির্ধারণ করত। সাধারণভাবে তারা খুন করার জন্য এমন একটি স্থান নির্বাচন করে যেটি সাধারণত জনশূন্য, কখনো কখনো একটি শুষ্ক জলপথের ধারে, বিস্তীর্ণ জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার রাস্তার মাঝখানে যেখানকার মাটি নরম সেই স্থানকে তার উপযুক্ত বলে মনে করত। ঘুমন্ত ব্যক্তিদের হত্যা করার জন্য এরা বিশেষ পন্থা অবলম্বন করতো। এক্ষেত্রে তারা ঘুমন্ত ব্যক্তিকে সাপ বা অন্য কিছুর ভয় দেখিয়ে ঘুম থেকে তুলে তারপর তাদের ফাঁস দিত। ঘোড়ার পিঠে থাকা যাত্রীদের হত্যা করার জন্য একটি বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করা হতো- প্রথমে ঘোড়াটির সামনে একজন এবং ঘোড়াটির পিছনে একজন অবস্থান নিত এবং তৃতীয় ব্যক্তি আরোহীকে কে কথায় আচ্ছন্ন করে রাখতো। এবং হঠাৎ করেই তার হাত ধরে আরোহীকে মাটিতে ফেলে দিত এবং চিরাচরিত প্রথা দ্বারা তাকে ফাঁস দেয়া হতো। যদি কোন ব্যক্তি নিজের সাথে অস্ত্র ধারণ করতো তাহলে ঠগীরা তাকে ফাঁস দেয়ার আগে সর্বপ্রথম তার হাত দুটিকে অচল করতো। ঠগীদের সাফল্যের অন্যতম কারণ ছিল তারা তাদের অপরাধের কোন রকমের চিহ্ন ফেলে রাখত না এবং সেই জন্যেই তারা মৃতদেহগুলিকে বিশেষ পদ্ধতিতে কবরস্থ করতো। এজন্য প্রত্যেকটি ঠগী দলেই বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা থাকতো যাদের কাজই ছিল এই মৃতদেহগুলির কবর দেওয়া। এ ক্ষেত্রে ঠগীরা একটি নির্দিষ্ট স্থান নির্বাচন করে সেখানে তিন থেকে চার ফুট গভীর গর্ত করতো। এই গর্তগুলো প্রয়োজন বিশেষে গোলাকার কিংবা চারকোণা দুই প্রকারের হতো। এরপরই গর্তে মৃতদেহ গুলির মুখ নিচের দিকে করে কবর দেয়া হতো। অনেক সময় ছুরি দিয়ে হাত এবং কাঁধের জয়েন্ট গুলিকে বিভক্ত করা হতো। গর্তটি ছোট হলে হাঁটুগুলিও বিচ্ছিন্ন করা হতো এবং পা শরীরের উপর দিকে ফিরিয়ে রাখা হত। মৃতদেহ যেন ফুলে না উঠে তার জন্য পেটটিকেও ফুটো করে দেয়া হতো। যদি কাছাকাছিতে মৃতদেহগুলিকে কবর দেয়ার উপযুক্ত স্থান খুঁজে না পাওয়া যেত তাহলে তারা

[৩] Sleeman (1839), pp. 49-51; শ্রীপান্থ, পৃ. ৫৮-৫৯; রায়, পৃ. ১৬০।

মৃতদেহগুলিকে একটি সুবিধাজনক স্থানে বস্তায় ভরে নিয়ে যেত, যেখানে এটি খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই, অথবা এটি কূপে ফেলা হত; শিকারের সাথে যদি কুকুর থাকে তবে সেটিকেও হত্যা করা হত, কারণ অনেক সময় বিশ্বস্ত পোষ্য মৃতদেহগুলিকে চিহ্নিত করে দেয়। ঠগীরা সবসময় নিজেদের সাথে ছুরি এবং কোদাল রাখতো।[৪]

ঠগীরা তাদের প্রাপ্ত লুট এর সম্পত্তিগুলিকেও যথাযথভাবে ভাগ করত। প্রথমে লুটের মধ্যে যদি কোন ভালো ঘোড়া বা অন্য কোন মূল্যবান বস্তু থাকে তা প্রভু স্থানীয় বা পলিকারদের জন্য তুলে রাখা হতো। লুটের একটি অংশ রাখা হতো ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের জন্য। একটি অংশ দেওয়া হতো দলের মৃত সদস্যদের পরিবারকে। অবশিষ্ট অংশ কয়েকটি অংশে বিভক্ত হতো- নেতার জন্য থাকতো দুটি অংশ, যে সকল ব্যক্তি প্রত্যক্ষ হত্যায় অংশ নিয়েছে এবং যে ব্যক্তি লাশ কেটেছে বা কবর দিয়েছে তারা পেত দেড় অংশ করে করে, এবং দলের প্রত্যেককে পেত এক অংশ করে করে। তবে সব সময় যে ভ্রমণকারীদের কাছ থেকে মূল্যবান কিছু পাওয়া যেত এমন নয় এমনও ঘটনা দেখা গেছে একসাথে ১২-১৩ জনের একটি দলকে হত্যা করার পর বিশেষ কিছুই পায়নি। তবে সে ঘটনা বিরল। ঠগীরা সাধারণত যে স্থানে তারা বিশ্রাম নেবার জন্য থামত সেই স্থানের বাসিন্দাদের হত্যা করা থেকে বিরত থাকত, তাদের লক্ষ্য থাকত এমন অভিযাত্রীর দল যারা নিজেদের গ্রাম বা বাড়ি থেকে অনেকটা দূরে সফর করছে। এক্ষেত্রে অভিযাত্রীদের বাড়ি ফেরার দিনক্ষণের ঠিক থাকে না তাই তারা যখন দীর্ঘ দিন পর্যন্ত বাড়ি ফেরেনা তখনও তাদের বন্ধুদের মনে তাদের খুন হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি সন্দেহে আসে না এবং যতদিনে তার সন্দেহ হয় ব্যক্তির কোন চিহ্ন এই দুনিয়ায় থাকে না। অনেক সময় দেখা যেত বেশ কিছু কোম্পানির সিপাহী ছুটি নিয়ে বাড়ি গিয়ে আর ফিরে এসে কোম্পানির বাহিনীতে যোগদান করত না। এক্ষেত্রে ধারণা করা হতো তারা হয়তো পালিয়ে গিয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখা যেত তারা রাস্তাতেই নিখোঁজ হয়ে গেছে এবং পরিবারের কাছে পৌঁছায়নি।

ঠগীরা যখন কোন দলকে শিকারের জন্য চিহ্নিত করত তখন তারা সেই দলের সাথে মিশে যেত এবং সেই দল সম্পর্কে সমস্ত খবর সংগ্রহ করত, যেমন তারা কোথা থেকে আসছে এবং কোন দিকে যাচ্ছে তাদের নিজের বাসস্থান কোথায় ইত্যাদি এবং এইসব খবর তারা ব্যবহার করত নিজেদের প্রয়োজনে। তারা নিশ্চিত করত যে লুটের মালগুলি যেন তাদের বাসস্থান বা তাদের পরিচিত অঞ্চলগুলির আশেপাশে না পৌঁছায়। ভারতবর্ষের প্রায় সব জায়গাতেই পেশাগতভাবে অর্থবাহক রয়েছে, যারা সমাজের নিচুশ্রেণীর হলেও স্বর্ণ রত্ন-জহরত এবং বিপুল পরিমাণ অর্থ দূরবর্তী স্থানে পরিবহন করে নিয়ে যায়। এরা প্রায়শই বিনা প্রহরী এবং বিনা অস্ত্রে যাতায়াত করত, তাদের বিশ্বস্ততা এবং বিচক্ষণতা নির্ভর করত তাদের ভিক্ষুক চেহারার উপর। সাধারণত এই শ্রেণীর লোকেরাই বোম্বে, সুরাটের বণিকদের স্বর্ণ এবং স্বর্ণ রত্ন-জহরত বহন করে নিয়ে যেত খান্দেশ, মালওয়া, ইন্দোর, এবং রাজপুতানা অঞ্চলে। ঠগীদের লক্ষ্য থাকতো এই ধরনের অর্থবাহকেরা এবং পিওনেরা। এছাড়াও তারা ধনী বণিক বা ব্যবসায়ীদের বড় দলগুলিকে আক্রমণ করতো। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি ঘটনার কথা বলা যায়– ১৮২৬ সালে চৌপাড়ায় তপতী নদীর ধারে ১৪ জন কে হত্যা করা হয় এবং প্রায় ২৫ হাজার টাকা লুঠ করা হয়। ১৮২৭ সালে খান্দেশ অঞ্চলের মালাগাউতে সাত জনকে হত্যা করা হয় এবং প্রায় ২২ হাজার টাকা লুঠ করা হয়। ১৮২৮ সালে খান্দেশ অঞ্চলের ধোরকোটে তিন জনকে হত্যা করা হয় এবং প্রায় ১২ হাজার টাকা লুঠ করা হয়। ১৮২৯ সালে নর্মদা নদী সংলগ্ন বুরবাহঘাট অঞ্চলে একসাথে ন'জনকে হত্যা

[৪] Sleeman (1839), pp. 19-24.

করা হয় এবং প্রায় ৪০ টাকা লুট করা হয়। অন্যদিকে ১৮২৯ সালে খান্দেশের ধরি অঞ্চলে ছয় জনকে হত্যা করে ৮২ হাজার টাকা লুঠ করা হয়। এই কর্মকাণ্ড গুলি সবই ছিল ঠগীদের, পরবর্তীকালে এদের গ্রেপ্তারের মাধ্যমে যা প্রমাণিত হয়। কিন্তু এই ঘটনাগুলি এবং এই বিপুল পরিমাণ অর্থ প্রমাণ করে ঠগী কার্যকৌশলতার কথা। সম্ভবত ঔপনিবেশিক ভারতে আর কোন অপরাধী গোষ্ঠী ঠগীদের মতন কার্যকৌশলতার প্রমাণ রাখতে পারেনি।[৫]

ঠগীরা এতটাই সঙ্ঘবদ্ধ ছিল যে তারা নিজেদের মধ্যে সাংকেতিক ভাষায় কথা বলতো। এই সাংকেতিক ভাষার নাম হল রামসি। এই ভাষার প্রায় সমস্ত ক্রিয়াপদ গুলি ভারতীয় ভাষা থেকে নেওয়া হয়েছে। তবে অঞ্চল ভেদে এই ভাষার সামান্য পার্থক্য হলেও প্রায় সকল ঠগী এই ভাষা বুঝতে এবং বলতে পারতো। অবস্থা অনুযায়ী দলপতিরা এই ভাষার সাহায্যেই বাক্য গঠন করে আদেশ দিতেন। যেমন ঝিরনী শব্দটির অর্থ হল ফাঁসি দেওয়ার চূড়ান্ত আদেশ। এর সাথে অন্য কোন শব্দ জুড়ে দলপতিরা বাক্য গঠন করে আদেশ দিতেন। যাতে শিকারের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ না জন্মায়। হেনরি স্লিম্যান এই রামসি ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন গ্রেপ্তার হওয়া বিভিন্ন ঠগীদের মাধ্যমে। তিনি এ ভাষার বেশ কিছু শব্দ ভান্ডার তৈরি করেছিলেন। উদাহরণ হিসেবে এ ভাষার কয়েকটি নমুনা এবং তার শব্দার্থ তুলে ধরা হলো-

১. আউলা / বোরা- ঠগী।

২.বিট্ট বা কুজ- ঠগী নয় ।

৩. আউলে খান, সালাম, আউলে ভাই, রাম রাম / আউলে সাহেব সালাম – সাম্মুখের দল ঠগী কিনা জানতে বলা হত, সাংকেতিক সম্বোধন বাক্য।

৪. জমাদার- ঠগী দলের দলপতি।

৫. চিসা- পয়সাওয়ালা শিকার।

৬. সোথা- যারা শিকারের সাথে বন্ধুত্ব করে এবং তাদের বিশ্বাস অর্জন করে।

৭. চান্দুরা- সোথাকে সাহায্য এবং শিকারের মনোরঞ্জন করে।

৮. লুগহা- কবর নির্মাণের দায়িত্বে।

৯. ভুকোত বা ভুরতোত- গলায় ফাঁস দেবার দায়িত্বে থাকা রুমাল ধারি যে ঠগী ।

১০. চামোচি বা চুমিয়া- শিকারের পা ধরে রাখবে।

১১. চুমোসিয়া বা সামসিয়া- শিকারের হাত আটকে রাখবে।

১২. বিয়াল বা বিল- হত্যাস্থান।

১৩. বেলহা বা বিলহো- যারা হত্যার স্থান নির্বাচনের দায়িত্বে থাকে।

১৪. ভোজারা- মৃতদেহ কবরে নিয়ে যাবে।

১৫. কুত্তরী মঞ্চ লেও- কবর প্রস্তুত করার নির্দেশ।

১৬. তামাকু লাও - হত্যার আদেশ। অবস্থা অনুযায়ী দলপতিরা এই আদেশ নানা রকম ভাবে দিতেন যেমন।

১৭. ধাগা লে আনা- যাত্রীদের সমন্ধে খোঁজ-খবর নিয়ে আসার নির্দেশ।

১৮. ঝিরনি- শ্বাসেরাধ করার নির্দেশ বা চূড়ান্ত নির্দেশ।

---

[৫] Sleeman (1839), pp .25, 41-42, 52-63, 77।

১৯. মাহি বা কাস্সি বা খুসসি- মন্ত্রপূত কোদাল। (আয়তনে ছোট, লম্বায় ছয় থেকে আট ইঞ্চি, ওজন ২ থেকে ৩ কিলো)।

২০. গুঙ্গা রাম- বিপদ, সাবধান।

২১. বাজিত খান- অর্থাৎ, কাজ শেষ (ভুকোত এর ঘোষণা)।

২২. তিলহাই- খবর সংগ্রহকারী গুপ্তচর।

২৩. লুগহা- কবর খুড়বার লোক।

২৪. কুরওয়া- চৌকো কবর ।

২৫. গাব্বা- গোলাকার কবর।

২৬. নাসার- নিরাপদ, টিক্কুর- বিপদ সংকুল ।

২৭. মাউলি- ঠগী পরিবারের জন্য টাকা বহনকারী।[৬]

স্লিম্যান সাহেব সারা ভারতবর্ষেই ঠগীদের ছড়িয়ে থাকার কথা বলেছেন। তবে তিনি এও বলেছেন অঞ্চল ভেদে ঠগীদের নানা রকম পার্থক্য ছিল তবে সে পার্থক্যগুলি খুব বেশি মৌলিক ছিল না। তবে তার মতে দাক্ষিণাত্যের অঞ্চলগুলিতে ঠগীদের সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে বেশি ছিল। তবে তার কারণ হয়তো এখানকার পরিবেশ এবং রাজনৈতিক অবস্থা তাদের জন্য অনুকূল ছিল। দাক্ষিণাত্যের ঠগীরা যে মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠ ছিল তা সাহিব খান নামে এক ঠগী নিজের জবানবন্দিতে স্লিম্যান কে জানায়। তবে এরা যে উত্তর ভারতেও যথেষ্ট পরিমাণে সক্রিয় ছিল সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। স্লিম্যান সাহেব উত্তর ভারতের ঠগীদের মূলত তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন- প্রথমটি মূলত মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে গঠিত এবং এরা দেশীয় জমিদারদের সুরক্ষা প্রাপ্ত, যেমন হুরা সিং, দিয়া রাম। দ্বিতীয় ধরনটি হিন্দুদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে গড়ে উঠেছিল, যারা বেশিরভাগই লোদেহ (lodeh) গোষ্ঠীর ছিল। এরা ইটাওয়ার পূর্ব অংশে এবং কানপুরের পার্শ্ববর্তী জেলায় প্রচুর সংখ্যায় বসবাস করত। এরা চাষবাসের সাথে জড়িত থাকার কারণে অনেকটাই সন্দেহ এড়াতে পেরেছিল। তৃতীয় শ্রেণিটি সংখ্যার বিচারে পূর্বোক্ত শ্রেণীগুলির থেকে বৃহত্তর এবং দেশের একটি বৃহত্তর অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত। এটি সমস্ত বর্ণ নিয়ে গঠিত। সিন্দাউস এবং পুরহারা পরগনা এবং মারাঠা অঞ্চলের পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে এদের আধিক্য লক্ষ্য করা যেত। ঠগ শব্দটি ভারতের দক্ষিণে অজানা নয়, তবে ফাঁসিগারদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, বরং এরা একশ্রেণীর প্রতারক, যারা প্রায়শই মুক্তা এবং প্রবাল বিক্রেতা হিসাবে উপস্থিত হতো এবং সাধারণ মানুষকে বিভিন্ন রকম ভাবে প্রতারণা করত। ঠগীদের এই কার্যকলাপ বংশানুক্রমিক হয়ে উঠেছিল এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। স্লিম্যান যখন ঠগীদের এই ব্যাপারে প্রশ্ন করেছেন এটা কি তাদের ব্যবসা, উত্তরে তারা বিস্মিতভাবে জানায় যে তারা নিজেদেরকে বাঘ বা অন্যান্য হিংস্র জন্তুর সাথে তুলনা করে, যারা নিজেদের বেঁচে থাকার জন্য অন্য পশুকে হত্যা করে। তারা মনে করে হত্যা করার অধিকার প্রকৃতি তাদেরকে দিয়েছে। তাদের এই অসংবেদনশীলতা এবং অবজ্ঞা তাদের নৃশংসতাকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেয়। তবে ঠগীরা অন্যান্য অপরাধী গোষ্ঠীদের মত কিন্তু এই পেশাতে আসেনি। বরং ছোটবেলা থেকেই তাদের অভ্যাসের মধ্যে একজন ঠগীর অভ্যাসগুলি ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাদের মতে একজন ঠগী কখনোই একটি বাঘকে হত্যা করে না এবং তারা বিশ্বাস করত বাঘটিও তাদের হত্যা করবে না যদি না সে নিজের দলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে থাকে।[৭]

---

[৬] Sleeman (1839), pp. 75-76; শ্রীপান্থ, পৃ. ৬৩, ৮৯ -৯৩; রায়, পৃ. ১৬৪-১৬৫।

[৭] Sleeman (1839), pp. 39, 43-44, 124.

তবে ঠগীদের এই কার্যকলাপে কিভাবে তারা নিজেদের সন্তানদেরকে নিয়ে আসতো সে কাহিনী জানা যায় স্লিম্যান এর দ্বারা ফিরাঙ্গিয়া এবং সাহিব খান এর জবানবন্দী থেকে। প্রথমেই তাদের থেকে জানা যায় যে তাদের সন্তানেরাও তাদেরই নৃশংস পেশার সাথে পরিচিত ছিল এবং সাহিব খানের থেকে জানা যায় এই পেশায় নিযুক্ত হওয়ার জন্য কোন বয়সের বিধি-নিষেধ ছিল না। সাধারণভাবে পিতার হাত ধরেই সন্তানেরা এই পেশাতে প্রবেশ করত। এরা রীতিমতন দীক্ষা দান করে নতুনদের এই পেশাতে আগমন ঘটাতো। এর সূচনা হতো অভিযানে যাত্রার সময় সন্তানদের সাথে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে। প্রথম যাত্রায় তারা কিছুই জানতে পারত না। শুধুমাত্র এখানেই তাদের দেশ-বিদেশের ঘুরে বেড়ানোর নেশাটি ধরিয়ে দেওয়া হতো। দ্বিতীয় বার যাত্রায় তারা জানতে পারতো তাদের পিতা খুন বা লুটের সাথে যুক্ত। তবে প্রত্যক্ষভাবে খুন দেখার জন্য তাদের অপেক্ষা করতে হতো তাদের তৃতীয়বারের যাত্রার জন্য। তবে এই সময় গুলি নতুন ছেলেটিকে লুটের ভাগ দেওয়া হতো। তবে অবশ্যই তা নানা রকম উপহার এর মাধ্যমে। এবং এরপরই একজন অভিজ্ঞ ঠগীকে তাদের গুরু বানিয়ে নব্যাগত এর দায়িত্ব দেয়া হতো। এই অভিজ্ঞ ঠগীর তত্ত্বাবধানে নব্যাগতরা ঠগী কার্যকলাপের সাথে পরিচয় লাভ করত। ঠগী দলপতি একটি নির্দিষ্ট দিন দেখে তার দীক্ষার ব্যবস্থা করত। এই দীক্ষা ব্যবসায় বেশ কিছু আচার অনুষ্ঠান পালিত হতো এবং এরপর হতো শপথ গ্রহণের অনুষ্ঠান। যদি ছেলেটি মুসলিম হয় তাহলে সে কোরান ছুঁয়ে কিম্বা হিন্দু হলে গঙ্গাজল ছুঁয়ে সে শপথ নিত। এরপর তার মুখে তুলে দেয়া হতো এক টুকরো মন্ত্রপুত গুড়। ঠগীদের বিশ্বাস এই গুড় যে একবার মুখে দেয় সে আজন্মকাল ঠগী হয়ে থেকে যায়। এরপর বাকি থেকে যায় শুধুমাত্র হাতে-কলমের শিক্ষা। তবে তার জন্য একটু অপেক্ষা করে খোঁজা হতো সহজ শিকার। কারণ নতুনদের হাতে প্রথমে বলিষ্ঠ পথিককে তুলে দেয়া যায় না। তাদের প্রথম হত্যার জন্য গুরু তাদের জন্য একটি বয়স্ক শিকারকে চিহ্নিত করত। এবং দলপতির আদেশে অবশেষে শিক্ষানবিশ ঝিরনি দান করত। সফলভাবে ঝিরনি দান করামাত্র তাকে একজন পরিপূর্ণ ঠগী হিসেবে ধরে নেয়া হতো। তবে শিক্ষাদানের ব্যাপারটি যে এতটা সোজা ছিল তা কিন্তু নয়। সে ঘটনা শোনা যায় স্লিম্যান এর জেরা কালীন শাহিব খান, ফিরঙ্গিয়া নামক ঠগীদের জবানবন্দীতে। তারা জানায় শিক্ষা চলাকালীন সময়ে খারহোরা নামক একটি ছেলে হত্যার দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে মারা যায়।

যদিও স্লিম্যান সাহেব ঠগীদের এই শিক্ষাদানের ব্যাপারটিকে তাদের একটি বৈশিষ্ট্য হিসেবে দেখার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আমাদের মনে রাখা দরকার ভারতবর্ষ প্রাচীনকাল থেকেই গুরু শিষ্য পরম্পরার ধারক এবং বাহক এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন পেশার অনুসারীরাও তাদের পেশার খুঁটিনাটি বিষয়গুলি শিক্ষাদানের মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে স্থানান্তরিত করে। স্বভাবতই ভারতবর্ষের অপরাধীরাও এর ব্যতিক্রম নয়। তবে ঠগীরা তাদের ঠগীবৃত্তিকে যে শুধুমাত্র একটি পেশা মনে করত তা নয় বরং এটি ছিল তাদের জীবন ধারণের পদ্ধতি। অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই তারা তাদের এই পরম্পরার নানা খুঁটিনাটি বিষয় তাদের সন্তানদের বা পরবর্ত প্রজন্মের কাছে স্থানান্তরিত করতে চেয়েছিল। এই ঠগীদের মধ্যে এই শিক্ষাদানের ঘটনা অত্যন্ত স্বাভাবিক। আবার এর থেকে এদের জটিল পরিবার তন্ত্রের বিষয়টিও সামনে আসে যেখানে এরা বংশপরম্পরায় অপরাধী হয়েও পিতা পুত্রের মত স্বাভাবিক সম্পর্ক গুলি বজায় রাখতে পেরেছিল। এ বিষয়ে শাহিব খান জানিয়েছিল তাদের পুত্ররাও অন্যান্য দের মত তাদের পিতাদের সম্মান দেয়।[৮]

ঠগীদের এই জটিল পরিবারতন্ত্রের অন্যতম উল্লেখযোগ্য অংশটি ছিল তাদের পরিবারের নারীরা। ঠগী পরিবারের নারীরা অন্য ঠগীগোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহ করত। তবে ঠগীদের এই গোষ্ঠীগুলির মধ্যেও যে বিভাজন

[৮] Sleeman (1839), pp. 127-128; শ্রী। পান্থ, পৃ. ৬৬- ৭২

ছিল একথা পষ্ট। বেশ কিছু ঠগীগোষ্ঠী নিজেদের অন্য ঠগীগুলির থেকে বেশি কুলীন বলে মনে করত। তার কারণ সম্ভবত এই দলগুলি কয়েক প্রজন্ম ধরে ঠগীবৃত্তির সাথে জড়িত। শাহিব খানের জেরা থেকে জানা যায় এই কুলীন দলগুলি নিম্ন শ্রেণীর দলগুলির সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করত না। আবার এরা অনেক সময় সাধারণ পরিবারের নারীদেরও বিবাহ করত। শাহিব খান স্লিম্যানকে জানায় যে দক্ষিণাঞ্চলের ঠগীরা নিজেদের কর্মকাণ্ড তাদের স্ত্রীদের থেকে গোপন রাখত। অর্থাৎ অঞ্চলভেদে ঠগী স্ত্রীদের ভূমিকার পরিবর্তন হতো। ঠগী পরিবারের নারীদের প্রধান ভূমিকা ছিল যখন পুরুষেরা বাইরে থাকবে তখন পরিবারের প্রতিপালন। তবে থেভেনট নামক এক বিদেশি পর্যটক এক ধরনের ঠগী বা ফাঁসিগার দের কথা বলেছেন যারা তাদের কাজে টোপ হিসাবে সুন্দরী মহিলাদের ব্যবহার করত। দক্ষিণ ভারতে এর কথাও তিনি বলছেন। এই জায়গাতেই একটি পরস্পর বিরোধিতা লক্ষ্য করা যায়। কারণ শাহিব খান দাক্ষিণাত্যেরই ঠগী। সম্ভবত যে সকল ঠগীরা তাদের স্ত্রীদেরকে তাদের কর্মকাণ্ডের কথা জানাতো সেই সকল স্ত্রীরা হয়তো এই কর্মকাণ্ডগুলিতে অনেক সময় যুক্ত থাকতো। আবার অনেক ঠগী স্থায়ী ভাবে বসবাস করত না, বরং যাযাবর ভাবে জীবন কাটাতো। তাই এই অবস্থায় সেই সকল ঠগী পরিবারের নারীরা নিশ্চয়ই ঠগীদের এই নৃশংস কার্যকলাপ সম্পর্কে অবগত ছিল এবং প্রয়োজনে তাদের সাহায্য করত। তবে ঠগীরা হত্যার প্রক্রিয়ায় বা তাদের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যকলাপে নারীদের কতটা ব্যবহার করত বা যুক্ত থাকার অনুমতি দিত সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। শাহিব খান জানায় তাদের সত্যিটা পরিবারের মহিলাদের কাছে প্রকাশ পেলে কিছু জন বাদে সবাই তাদের সঙ্গ দেবে। এবং তাকে যখন প্রশ্ন করা হয় তাদের পরিবারের স্ত্রীরা কি তাদের ভয় পায় তখন সে জানায় হয়তো তারা ভয় পায় কিন্তু ঠগীদের মধ্যে নারী হত্যার ঘটনা খুবই কম। তবে ঠগীদের নারী হত্যার প্রসঙ্গে আলোচনা করতে হলে তাদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান বা বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন, কারণ নারী হত্যার প্রসঙ্গ ঠগীদের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির সাথে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। রুক্মিণী নামে একজন ঠগী দলপতির স্ত্রী ধরা পড়েন, যিনি তাঁর স্বামীকে সাহায্য করতেন। জেরা থেকে জানা যায় রুক্মিনীর বাবা-মাকেও ঠগী হত্যা করে এবং ছোটবেলা থেকেই সে ঠগী দলেই বড় হয়েছে। পরবর্তীতে ঠগী সর্দারের সাথেই তার বিয়ে হয়। অনেক সময় দেখা যেত ঠগী সর্দারদের একাধিক স্ত্রী থাকতো।[৯]

ঠগী সম্প্রদায়ের সবথেকে চমকপ্রদ জিনিসটি ছিল তাদের ধর্মীয় আচার-আচরণ। স্লিম্যান ঠগীদের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন ঠগীরাও অন্যান্য ভারতীয় অপরাধী শ্রেণীর মতন কুসংস্কার আচ্ছন্ন এবং অন্ধবিশ্বাসী ছিল। যা হয়তো তৎকালীন সময়ের ভারতবর্ষকে কুসংস্কারের দেশ বলা ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গিরি প্রতিফলন। তবে ধর্মীয় আচার-আচরণের দিক থেকে ঠগীদের যে একটি আলাদা পরিচিতি গড়ে উঠেছিল একথা অবশ্যই সত্য। এবংতাদের এই ধর্মীয় বিশ্বাস কে ঠগীদের মূল মেরুদন্ড বললে ভুল হয় না। ঠগী সম্প্রদায়ের ধর্মের সবথেকে চিত্তাকর্ষক দিকটি হল ঠগী সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠ ভাবে মুসলিম হলেও এদের আচার অনুষ্ঠানগুলি প্রায় সবগুলি হিন্দু ধর্মীয়। ঠগীদের মধ্যে মূর্তি পূজার প্রচলন ছিল। তারা মূলত ভবানী বা কালী এবং বেশ কিছু আঞ্চলিক দেবীদের পূজো করতো। ঠগীদের ধর্মীয় বিশ্বাসের বীজ নিহিত রয়েছে একটি পৌরাণিক উপাখ্যানের মধ্যে। তাই সমস্ত ঠগীরা এই পৌরাণিক গল্পটিকেই তাদের উদ্ভব কাহিনী বলে দাবি করে।

সেই পৌরাণিক উপাখ্যান অনুসারে পৃথিবীতে একসময় রক্তবীজ নামক এক মহাদানবের আবির্ভাব ঘটে এবং যার থেকে মানবকুলকে উদ্ধার করার জন্য দেবী ভবানী বা দেবী কালী তার সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন।

---

[৯] Sleeman (1839), pp. 45- 46, 122-126; শ্রীপান্থ, পৃ. ৬০-৬১।

তবে এই রক্তবীজের বিশেষ ক্ষমতা ছিল যে তার পড়া প্রতিটি রক্ত বিন্দুর থেকে আবার নতুন এক দানব জন্ম নিত। হিন্দু ধর্মের মূল কাহিনীটি মোটামুটি ভাবে একই রকম হলেও ঠগীদের প্রচলিত কাহিনীটিতে সামান্য রদবদল রয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে যে সেই দানবের সাথে যুদ্ধ করার সময় দেবী যখন ক্লান্ত হয়ে পড়েন, তখন তাঁর শরীর থেকে নিঃসৃত দুই ফোঁটা ঘাম থেকে জন্ম নেয় দুইজন মানুষ। তখন দেবী নিজের পরিহিত বস্ত্র থেকে দুই খন্ড কাপড় সেই দুজনকে দেন ফাঁস হিসাবে এবং আদেশ দেন সেই অসুরদেরকে ফাঁস দেবার। দানবের দমন করার পর দেবী সেই দুজন মানুষকে আশীর্বাদস্বরূপ সেই ফাঁস টি দেন এবং যারা ধর্মের বিপক্ষে তাদের নিধন করার আদেশ দেন। প্রথমদিকে হত্যার পর দেহের দায়িত্ব ছিল দেবীর, তবে কিছু ঠগী দেবীর শর্ত ভঙ্গ করে হত্যা করার পর পেছনে ফিরে তাকায়। যার ফলে দেবী কুপিত হন। তবে অনেক অনুনয়-বিনয়ের পরে দেবী পুনরায় প্রসন্ন হয়ে নিজের একখানা দাঁত থেকে তাদের একটি কোদাল ও বুকের পাঁজর থেকে ছুরি দেন এবং বলেন এই ছুরির দ্বারা তোমরা মৃতদেহকে খন্ড করে এবং কোদাল দিয়ে কবর খুঁড়ে তার মধ্যে মৃতদেহকে রাখবে। এই কাহিনীটিকেই ঠগীরা বংশ পরম্পরায় তাদের উদ্ভব কাহিনী বলে মনে করে থাকে। দেবীর প্রতি অগাধ বিশ্বাস থেকেই তারা নারী হত্যা থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করে। তবে বেশ কিছু ঘটনার কথা আলোচনা করলে বোঝা যায়, অনেক ক্ষেত্রেই তারা নারী হত্যা করতে পিছপা হত না। নারী হত্যার একটি উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ১৮০০ সাল নাগাদ মোহাম্মদ রউস নামে একজন ঠগী দ্বারা কৃষ্ণা রায়ের স্ত্রীসহ তার ভাগ্নে, একজন ব্রাহ্মণ রাঁধুনি, দুই মহিলা পরিচারিকা, দুইজন পিয়ন, দুইজন কুলি, এবং চারটি ঘোড়ার নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার ঘটনা রয়েছে। প্রসঙ্গত শাহিব খানের কথা থেকে উঠে এসেছে যে যদি কখনো বেশ ধনী মহিলা পাওয়া যায় তখন তাকে হত্যা করার জন্য লুটের কিছু অংশ বেশি দেওয়ার লোভ দেখিয়ে দলের একজনকেই সেই ভার দেয়া হয়, যেন নারী হত্যার সেই পাপ সেই ব্যক্তি একাই ভোগ করে।[১০]

ঠগীদের কাছে দুটি প্রধান তীর্থক্ষেত্র ছিল কলকাতার কালীঘাটের কালী মন্দির এবং বিন্ধ্যাচলের ভবানী মন্দির। তবে তারা তাদের আচার অনুষ্ঠানগুলি পালন করতো নিজ নিজ স্থানে এবং অত্যন্ত গোপনে। স্লিম্যানের গ্রেপ্তার করা বহু ঠগীর জবানবন্দী থেকে এইসব আচার অনুষ্ঠানগুলির কথা উঠে আসে। অঞ্চল ভেদে এবং গোষ্ঠী ভেদে ঠগীদের আচার অনুষ্ঠান গুলিতে নানারকম পরিবর্তন থাকলেও মৌলিক কাঠামোটি ছিল অপরিবর্তিত। ঠগীদের মধ্যে যে মূর্তিপূজার বিশেষ চল ছিল একথা সর্বজনবিদিত, হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে। ঠগীরা তাদের যাবতীয় অনুষ্ঠানগুলি যাত্রা শুরুর আগে পালন করতো এবং এ বিষয়ে তারা বিভিন্ন রকমের লক্ষণ চিহ্ন কে বিশেষ গুরুত্ব দিত, এগুলিকে দৈব ইঙ্গিত হিসেবে মনে করতো। এদের অনুষ্ঠানগুলিতে ছিল নানা রকমের আইন কানুন এবং বিধি-নিষেধ। ঠগীরা নিজেদের ব্যবহৃত সরঞ্জাম গুলিকেও দৈব গুণসম্পন্ন বলে মনে করত এবং এর মধ্যে সবথেকে রহস্যময় এবং গুরুত্বপূর্ণ ছিল কোদাল। ঠগীদের উৎপত্তি বিষয়ক অলৌকিক কাহিনীতে বলা হয়েছে দেবীর দাঁত থেকেই থেকেই তাদের কোদালের উৎপত্তি, তাই এটি তাদের কাছে বিশেষ পবিত্র ও অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন। তাই যাত্রা শুরু করার প্রথমেই ঠগী দলের সরদার একটি ভালো দিন দেখে নিজে গিয়ে কামারের কাছ থেকে এই কোদাল গড়িয়ে আনেন। কোদালটি আকৃতিতে হতো ছোট আকারের। লম্বায় মাত্র ছয় থেকে আট ইঞ্চি এবং ওজন দুই থেকে ৩ কিলো। কোদালটি কোন হাতল থাকতো না প্রত্যেকবার দরকারের সময় এতে নতুন কাঠের হাতল লাগিয়ে ব্যবহার করা হতো। এরপর বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কোদালটিকে মন্ত্রপুত করা হয় এবং অনুষ্ঠান শেষে সেই কোদালটি একজন বিশ্বস্ত ঠগীর

[১০] Sleeman (1839), pp. 26, p29-30; Colonel James L. Sleeman, *Thug or A Million Murders*; London: Sampson Low, Marston & Co.Ltd, 1918; pp., 21-22, 12; শ্রীপান্থ, পৃ. ১০৫-১০৭।

হাতে তুলে দেয়া হয় এবং এই যাত্রার সময় কোদালের দায়িত্ব থাকবে সেই দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠগীর উপরেই। প্রত্যেকটি যাত্রার সময়ে এই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি ঘটে। ঠগীদের কাছে এই কোদালের মাহাত্ম্য অপরিসীম। এই কোদালকে ঘিরে ঠগীদের অনেক বিশ্বাস। ঠগীদের দল কোন দিকে যাত্রা করবে এ বিষয়ে জানার জন্য ঠগীরা কোদালের উপর নির্ভর করত। এ বিষয়ে জানার জন্য তারা প্রথমে যাত্রার জন্য একটি দিক নির্ধারণ করে কোদালের মাথাটি সেই দিকে রেখে তাকে সারারাত মাটি চাপা দিয়ে রাখা হতো। পরের দিন ভোরবেলায় যদি দেখা যেত কোদালের মাথাটি যেই দিকে পুঁতে রাখা হয়েছিল যদি সেই দিকেই থাকে তাহলে তারা ঠিক দিকেই যাত্রা করছে কিন্তু যদি মাথাটি দিক পরিবর্তন করতো তবে তারাও দিক পরিবর্তন করতো। কোদাল কে জুড়ে ঠগীদের আরেকটি সব থেকে বড় বিশ্বাস ছিল যে মন্ত্রপূত কোদাল তার বাহকের আবাহনে নিজে নিজেই কুয়ো থেকে উঠে আসে এবং এ বিষয়ে স্লিম্যানকে শাহিব খানও একই কথা জানিয়েছে। তবে শাহিব খানকে যখন প্রশ্ন করা হয় যে সে কখনো কোদালের অলৌকিক ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করেছে কিনা তখন সে জানায় যে সে জীবনে মাত্র একবার এরকম ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে যখন সে আর্কট এর একটি দলের সাথে অভিযানে ছিল। তবে সে নিজের চোখে কোদালটিকে উঠে আসতে দেখেনি। তবে অলৌকিকতাকে বাদ দিল ঠগীরা যে কোদাল হাতে যথেষ্ট পটু ছিল সে কথা প্রমাণ করে তাদের নিপুন কৌশলের দ্বারা মৃতদেহগুলিকে কবরস্থ করার মধ্য দিয়ে। এবং তারা এই কাজে এতটাই দক্ষ ছিল যে তাদের দ্বারা কবরীকৃত স্থান গুলি দেখে কোনোমতেই সন্দেহ হতো না যে সেই স্থানে মৃতদেহ প্রথা রয়েছে এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা বলা যায়। যেখানে ফিরিঙ্গিয়া নামক একজন ঠগী স্লিম্যানকে মৃতদেহ কবর দেয়া আছে বলে এমন স্থান দেখায় যে স্থান ছিল খোদ স্লিম্যানের তাঁবুর নিচে এবং এই তথ্যের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য যখন সেই স্থানগুলি খনন করা হয় তখন সেইখান থেকে সত্যি সত্যি মৃতদেহ পাওয়া যায়।[১১]

কোদালের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার পর একটি দিন নির্বাচন করা হতো যাত্রার দিন হিসেবে। যাত্রা শুরু করার আগে আরেকটি অনুষ্ঠান পালন করা হতো। অনুষ্ঠানে দেবীর একটি প্রতিকৃতি রাখা হতো এবং তাঁর সামনে রাখা হতো কোন সরীসৃপের প্রতিকৃতি। ঠগীদের যাবতীয় সরঞ্জামও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতো। এই অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল বলিদান। বলি প্রদত্ত জীবটি সাধারণভাবে হতো ভেড়া কিংবা ছাগল। অনুষ্ঠানে বলিদান এর পর জীবটির কাটা মাথার উপর একটি জ্বলন্ত প্রদীপ রেখে দেবীর সামনে অর্পণ করা হত এবং যদি দেখা যেত মাথাটির কান বা নাক দিয়ে কোন রকমের তরল নির্গত হচ্ছে তাহলে ধরে নিতে হবে যাত্রায় দেবীর সম্মতি রয়েছে। কিন্তু যদি তা না হয় তাহলে বুঝতে হবে দেবী সম্মতি দিচ্ছেন না। এরপর সেই বলির প্রসাদ সকল ঠগীরাই গ্রহণ করত। এই অনুষ্ঠানের ১৫ থেকে ২০ দিন পর দল যাত্রা শুরু করতো। ঠগীরা বিভিন্ন রকমের নিয়ম মেনে চলত এবং তারা শুভ এবং অশুভ কে বিশেষ গুরুত্ব দিত। বেশকিছু ঘটনা কে ঠগীরা তাদের জন্য শুভ লক্ষণ বলে মনে করতো, আবার বেশ কিছু ঘটনাকে মনে করতো অশুভ বলে। তারা মনে করত এই সকল ঘটনাগুলির দ্বারাই দেবীর সাবধান বাণী বা আদেশ তাদের কাছে পৌঁছে থাকে। উদাহরণস্বরূপ ঠগীদের জন্য বেশ কিছু শুভ লক্ষণ হলো একটি টিকটিকি কিচিরমিচির করছে, যাত্রার সূচনাপথের বাম পাশে একটি জীবন্ত গাছে একটি কাক শব্দ করছে, একটি বাঘের উপস্থিতি। এছাড়া বেশ কিছু লক্ষণের বিভিন্ন রকমের মানে ঠগীদের কাছে ছিল যেমন পথের ডান দিকে একটি তিতির শব্দ করছে যা থেকে বোঝায় যে খুব ভাল লুঠ পাওয়া যাবে। অনুরূপভাবে অশুভ লক্ষণ গুলি হল একটি খরগোশ বা একটি সাপ রাস্তা

[১১] Sleeman (1839), pp. 97, 120- 122; Sleeman (1918), pp. 8-9; শ্রীপান্থ, পৃ. ৬১-৬৩।

অতিক্রম করছে। একটি কাক পাথর বা মরা গাছে বসে আওয়াজ করছে। একটি পেঁচা চিৎকার করছে। একাকী শিয়ালের আওয়াজ। ঠগীরা তাদের জন্য চরম অশুভ লক্ষণ বলে মনে করতো তাদের বলি দেওয়া প্রাণীটির মাথা কুকুরে টেনে নিয়ে নিয়ে যাওয়াকে। এছাড়াও ঠগীরা আরো বহু ধরনের নিয়ম মেনে চলার চেষ্টা করত। তবে সব ক্ষেত্রেই যে যথাযথভাবে নিয়মগুলি পালন করা হতো এমন কোন পাথুরে প্রমাণ নেই। ঠগীরা বিশ্বাস করতো যে এই সমস্ত নিয়মগুলি তারা ঠিক ঠিক ভাবে পালন করলে দেবী স্বয়ং তাদের রক্ষা করবেন। এমনকি স্লিম্যান এর কাছে নাসির নামে একজন ঠগী নিজের সাথে আরো ১৭ জন ঠগীর ধরা পড়ার জন্য একটি খরগোশের রাস্তা পারাপার করার ঘটনাকে অগ্রাহ্য করে এগিয়ে যাওয়াকে দায়ী করেছেন। হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষেই প্রায় সমস্ত ঠগীরাই এই সকল নিয়মগুলিকে যথাসম্ভব মেনে চলার চেষ্টা করত, যদিও অঞ্চল এবং গোষ্ঠীভেদে এই সকল নিয়ম গুলির সামান্য কিছু তারতম্য অবশ্যই ছিল। তবে ঠগীদের এই বিচিত্র ধর্মীয় বিশ্বাসে কখনোই কোন ঠগীর নিজস্ব ধর্মীয় পরিচয় বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি, বরং সেখানে দেখা গেছে অদ্ভুত এক বোঝাপড়া। স্লিম্যান যখন এক মুসলিম ঠগীকে প্রশ্ন করে তার কোরান-কে মেনে চলার ব্যাপারে তখন সে অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে জানায় যে তারা যথাযথভাবে কোরান-কে অনুসরণ করে। কিন্তু যখন সেই একই ঠগীকে প্রশ্ন করা হয় যে ঠগীদের আরাধ্য দেবী ভবানী বা কালীর কথা কি কোরানেও লেখা আছে তখন সে জানায় হিন্দুস্তানের মুসলিম ঠগীরা মনে করে, মুহাম্মদের কন্যা এবং আলির স্ত্রী ফাতিমা এবং ভবানী এক এবং ফাতিমাই ঠগীদের কিংবদন্তির দেবী। ঠগীরা মনে করত তারা শুধুমাত্র দেবীর আদেশে খুন করে, তাই এই খুনগুলোর জন্য না তাদের কোন রকমের অনুশোচনা হয় না তারা পাপের ভাগীদার হয়। একজন মুসলিম ঠগীকে যখন প্রশ্ন করা হয় হিন্দুদের দেবী ভবানীর কি তোমাদের স্বর্গের উপর কোন কর্তৃত্ব আছে, তখন সে জানায় যে সেই দেবীর তাদের স্বর্গের উপর কোন কর্তৃত্ব না থাকলেও সেই দেবী মৃত্যুর আগেই এই পৃথিবীতে তাদের ভাগ্যকে পরিচালিত করেন। তাই মৃত্যুর পর তারা অবশ্যই স্বর্গের অধিকারী হন এবং তার জন্য ধর্ম কখনোই বাধা হয় না।[১২]

ভারতবর্ষের ইতিহাসে ঠগী সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যের একমাত্র আকর ধরা হয় হেনরি স্লিম্যানের রচনাগুলিকে। আবার স্লিম্যানও তাঁর রচনাগুলির মূল তথ্যের ভিত্তি হিসেবে তুলে ধরেছেন প্রশাসনের হাতে গ্রেপ্তার হওয়া বিভিন্ন ঠগীদের জবানবন্দিকে। তাই ঠগী সংক্রান্ত যাবতীয় রচনার ক্ষেত্রে মূল সমস্যা এটিই। স্লিম্যান যেহেতু একজন ব্রিটিশ রাজকর্মচারী ছিলেন এবং তিনি নিজেও ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা চালিত ছিলেন তাই তাঁর রচনাগুলিকে কখনোই নিরপেক্ষ বলে ধরে নেয়া যায় না। গ্রেপ্তার হওয়া ঠগীরাও যে স্লিম্যানকে সমস্ত সত্যি কথা বলবে এটাও ধরে নেয়া যায় না। তাই স্বাভাবিকভাবেই স্লিম্যানের ঠগী সম্পর্কিত যাবতীয় কাজকে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। অনেক ঐতিহাসিকই ঠগীদেরকে একটি পৃথক অপরাধী সম্প্রদায় হিসেবে মানতে রাজি হননি। বরং ঠগীদেরকে একটি কাল্পনিক ও ঔপনিবেশিক স্বার্থান্বেষী উপস্থাপন বলে তুলে ধরেন। তাদের মূল বক্তব্য ছিলো স্লিম্যানের রহস্যময় অপরাধী শ্রেণি হিসাবে ঠগীদের আবিষ্কার এবং নিজেই সেই রহস্য উন্মোচন করে ঠগী দমন আর কিছুই নয় বরং ঔপনিবেশিক শাসনের বৈধতা ও প্রয়োজনীয়তা প্রমাণের একটি দিক মাত্র। প্রসঙ্গত, তাদের প্রধান যুক্তি ছিল স্লিম্যানের দলিল গুলির প্রামাণ্যতা।[১৩]

---

[১২] Sleeman (1839), pp. 26-28, 124- 126; শ্রীপান্থ, পৃ. ৭২ -৭৫।

[১৩] তপোবন ভট্টাচার্য, "উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক ভারতে ঠগীর উপস্থাপন: একটি কাল্পনিক অপরাধিত্ব নির্মাণের রূপরেখা", *ইতিহাস এষণা ৫*, ২০২৪, পৃ ১৬৫, ১৬৭ -১৭০।

তবে গোটা ঠগী বিষয়টিকেই কাল্পনিক বলে ব্যাখ্যা করা যুক্তিযুক্ত নয়। ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষ যে অস্থির এবং টালমাটাল রাজনৈতিক পরিস্থিতির শিকার ছিল এ কথা প্রায় সর্বজনবিদিত। এই পরিস্থিতির সুযোগে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল নানা অপরাধী এবং অপরাধ। তাদের মধ্যে অনেকেই বিভিন্ন ব্যতিক্রমী পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন এই অপরাধগুলি সংগঠিত করার জন্য। তাছাড়া ভারতবর্ষের বিপুল অস্ত্রাগারে নানা ভয়ংকর অস্ত্র থাকা সত্ত্বেও ঠগীরা কেন ফাঁসকেই তাদের অস্ত্র নির্বাচন করেছিল এবং ঠগীদের বিচিত্র কার্যপদ্ধতি (মোডাস অপারেন্ডি) বা নৃশংসতাই কেন তাদেরকে অন্যান্য অপরাধীদের থেকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করছিল, তাও ভাবার বিষয়। ঠগীরা তাদের অপরাধের বৈধতা প্রদান করার চেষ্টা করেছিল তাদের ধর্মীয় ব্যাখ্যা এবং ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানগুলির মাধ্যমে। এই প্রবন্ধের কাজে ব্যবহৃত আমার প্রধান উপাদান গুলি দেখলে এবং স্লিম্যানের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করলে বলতে হয় স্লিম্যান নিজেও ঠগীদেরকে একটি সংঘবদ্ধ অপরাধী শ্রেণী হিসেবেই দেখতে বা দেখাতে চেয়েছেন। তবে স্লিম্যান ঠগীদের দ্বারা ঘটিত অপরাধের যে বিবরণ দিয়েছেন তা দেখলে মনে হয় ঠগীরা সত্যিই এটি সঙ্ঘবদ্ধ শ্রেণীর রূপেই বিচরণ করতো। সেক্ষেত্রে আমাদের মাথায় রাখা দরকার ঔপনিবেশিক উপাদানের কতটুকু গ্রহণযোগ্য এবং স্লিম্যানের রচনায় কতটা অতিরঞ্জন রয়েছে। তবে ফাঁস ব্যবহারকারী এক শ্রেণীর অপরাধী যে ভারতবর্ষে ছিল একথা বিদেশি পর্যটক থেভেনটও বলেছেন। সর্বশেষে, এই গবেষণা প্রমাণ করে যে, ঠগীদের সম্পর্কে স্লিম্যানের গ্রন্থের বিশ্লেষণ কেবলমাত্র একটি ঐতিহাসিক নথির দৃষ্টিতে নয়, বরং ঔপনিবেশিক ক্ষমতার কৌশল ও নীতির অন্তর্দৃষ্টির দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ। ঠগীদের অপরাধের প্রকৃতি ও তাদের সমাজে প্রভাব বোঝার জন্য স্লিম্যানের কাজ একটি মূল্যবান উৎস হলেও, এটিকে একটি রাজনৈতিক ও সাম্রাজ্যবাদী লক্ষ্য পূরণের অংশ হিসেবে দেখা উচিত।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. Wagner, Kim A. Thuggee: Banditry and the British in Early Nineteenth-Century India. New York: Palgrave Macmillan, 2007।

২. সিংহ, রাধিকা। এ ডেসপটিজম অফ ল': ক্রাইম অ্যান্ড জাস্টিস ইন আর্লি কলোনিয়াল ইন্ডিয়া। দিল্লি: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৮।

৩. Sleeman, W. H. History of the Thugs or Phansigars of India. Philadelphia: Carey & Hart, 1839।

৪. Sleeman, James L. Thug or A Million Murders. London: Sampson Low, 1918।

৫. শ্রীপান্থ। ঠগী। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৬০।

৬. ভট্টাচার্য, তপোবন। "উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক ভারতে ঠগীর উপস্থাপন।" ইতিহাস এষণা, ২০২৪।

৭. রায়, অরিন্দম। "ঠগী: এক ভ্রাম্যমাণ খুনে সম্প্রদায়।" ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ২০১৮।

৮. নন্দী, সুগত। "গুন্ডাস অফ ক্যালকাটা।" Routledge Handbook, ২০২০।

৯. বাসু, সৌমিত্র। দ্য হিস্ট্রি অফ ফরেনসিক সায়েন্স ইন ইন্ডিয়া। নিউ ইয়র্ক: রাউটলেজ, ২০২১।